يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ—বাক্যের দাবী ছিল এই যে, এরপরেও একবচনের বিধান বর্ণনা করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষ-ভাবে আপনার জন্য নয়---সমগ্র উম্মতের জন্য।

কেউ কেউ এ স্থলে বাক্য উহ্য সাব্যস্ত করে এরূপ তফসীর করেছেন যে, হে নবী! আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান-فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ—عدت-এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় সেই সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। এক. স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদ্দতকে 'ইদ্দতে-ওফাত' বলা হয়। গর্ভবতী নয়--এমন মহিলাদের জন্য এই ইদ্দত চার মাস দশ দিন। দুই. বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়---এমন মহিলাদের জন্য তালাকের ইদ্দত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়েয। ইমাম শাফেয়ী (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদ্দত তিন তোহ্র (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্য কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই ; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদ্দত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়েয হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত একই রূপ।

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতকে فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ পাঠ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ও এক রেওয়ায়েতে فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ বর্ণিত আছে। ---(রূহুল-মা'আনী)

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) একথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায হয়ে বললেন ঃ

ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة التى امر ها الله تعالى ان يطلق بها النساء ـ

তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেওয়া। এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ্ তা'আলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়--এক. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। দুই. কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া ওয়াজিব [যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। ইবনে ওমর (রা)-এর ঘটনায় তদ্রূপই ছিল]। তিন. যে তোহ্রে তালাক দেবে, সেই তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। চার. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতের তফসীর তাই।

উপরোক্ত কেরাতদ্বয় এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে হায়েয থেকে ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহরে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, সেই তোহরে সহবাস করবে না এবং তোহরের শেষ ভাগে হায়েয আসার পূর্বে তালাক দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে ইদ্দত তোহ্র থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহ্রের শুরুতেই তালাক দেবে। ইদ্দত তিন হায়েয হবে, না তিন তোহর হবে---এই আলোচনা সূরা বাকারার ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ বাক্যে করা হয়েছে।

সারকথা, এই আয়াত থেকে তালাক সম্পর্কে প্রথম সর্বসম্মত বিধান এই জানা গেল যে, হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম এবং যে তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই তোহরে তালাক দেওয়াও হারাম। উভয় ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কারণ হল স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়া যা তার জন্য কষ্টকর। কেননা, যে হায়েযে তালাক দেবে, সেই হায়েয তো ইদ্দতে গণ্য হবে না বরং হায়েযের দিনগুলো অতিবাহিত হবে। এরপর হানাফী মযহাব অনুযায়ী পরবর্তী তোহ্রও অযথা অতিবাহিত হয়ে দ্বিতীয় হায়েয থেকে ইদ্দতের গণনা শুরু হবে। এভাবে দীর্ঘদিন পর ইদ্দত শেষ হবে। শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ীও ইদ্দতের পূর্বে অতিবাহিত হায়েযের অবশিষ্ট দিনগুলো কমপক্ষে বেশী হবে। তালাকের এই প্রথম বিধানই দিকনির্দেশ

করে যে, তালাক কোন রাগ মিটানোর অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয় নয় বরং এটা অপারক অবস্থায় উভয় পক্ষের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা। তাই তালাক দেওয়ার সময়েই এদিক খেয়াল রাখা জরুরী যে, স্ত্রীকে যেন দীর্ঘদিন ইদ্দত অতিবাহিত করার অহেতুক কষ্ট ভোগ করতে না হয়। এই বিধান কেবল সেই স্ত্রীদের জন্য, যাদের পক্ষে হায়েয অথবা তোহর দ্বারা ইদ্দত অতিবাহিত করা জরুরী। পক্ষান্তরে যে স্ত্রীর সাথে এখনও স্বামীর নির্জনবাসই হয়নি, তার যেহেতু কোন ইদ্দতই নেই, তাই তাকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয। এমনিভাবে যেসব স্ত্রীর স্বল্প বয়স অথবা বেশী বয়স হেতু হায়েয আসে না, তাদেরকে যে কোন অবস্থায় এমনকি সহবাসের পরে তালাক দেওয়া জায়েয। কেননা তাদের ইদ্দত মাসের হিসাবে তিন মাস হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে একথা বর্ণিত হবে।--(মাযহারী)

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ শব্দের অর্থ গণনা করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সযত্নে স্মরণ রেখো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেওয়ার মত ভুল করো না। ইদ্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়; স্ত্রীরা প্রসঙ্গত তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ—অর্থাৎ

স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোন কৃপা নয় বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং ইদ্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম; যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আল্লাহ্‌রও হক, যা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মযহাব তাই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ—অর্থাৎ ইদ্দত পালন-

কারিণী স্ত্রী কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

এক. নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যত ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয় বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণত এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষ্যত্বই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলা বাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয় বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হল যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয় বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সুদ্দী, ইবনে মায়েব, নাখয়ী (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।---(রূহুল মা'আনী)

দুই. নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহ্হাক, ইকরিমা (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।

তিন. নির্লজ্জ কাজ বলে কটূ কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কটূভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর কেরাত এরূপ إِلَّا أَنْ يَّفْحَشْنَ এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।----(রূহুল মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

এ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হল। পরে আরও বিধান বর্ণিত হবে। কিন্তু মাঝখানে বর্ণিত বিধানসমূহের প্রতি জোর দেওয়া এবং বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতিপয় উপদেশ বাক্যের অবতারণা করা হচ্ছে। কোরআন পাকের বিশেষ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যেক বিধানের পর আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালের চিন্তা স্মরণ করিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ রুদ্ধ করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রাপ্য পূর্ণরূপে আদায় করার ব্যবস্থা কোন আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ভীতি ও পরকাল চিন্তাই প্রকৃষ্ট উপায়।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ - لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ

اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا—حُدُوْدُ اللّٰهِ বলে শরীয়তের নির্ধারিত আইন-কানুন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লংঘন করে অর্থাৎ আইন-কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে অর্থাৎ আল্লাহ্ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ্ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পর্যন্ত পৌঁছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয় বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। এক. আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আইন-কানুন লংঘন করার শাস্তি এবং দুই. স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি। এর স্বরূপ এই ঃ

پنداشت ستمگر جفا بر ما کرد
برگردن وے بماند و بر ماگذشت

لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا অর্থাৎ তুমি জান না সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা এই রাগ-গোসার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেওয়ার সময় শরীয়তের আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেওয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ব বিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পুনর্বিবাহও হালাল হয় না।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

—এখানে اجل শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং اجل পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম, না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া ভাল। এ চিন্তার জন্য এ সময়টি উত্তম। কারণ, তত দিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোসা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্য দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হতে দাও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান ঃ ইদ্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেওয়ার--উভয় অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারূফ অর্থাৎ যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। 'মারূফ' শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পন্থা শরীয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজেকর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্য সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন্ বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফিকহ্‌র কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেওয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেওয়া থেকে এবং পূর্ববর্তী لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দেবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দেবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোসা প্রকাশার্থে এমন কোন বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন করে। উদাহরণত এরূপ বলবে না, আমার বাড়ী থেকে বের হয়ে যাও, তোমাকে খুব শক্ত তালাক দিচ্ছি, এখন তোমার সাথে আমার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক রইল না। এ ধরনের বাক্য পরিষ্কার তালাকের সাথে বলে দিলে অথবা তালাকের নিয়তে কেবল এ ধরনের বাক্য বলে দিলেও প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং শরীয়তের পরিভাষায় 'বাইন' তালাক হয়ে যায়। ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিক-ভাবে ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা থাকে না। তদপেক্ষা কঠোর তালাক হচ্ছে তালাককে তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া। এর ফলশ্রুতিতে স্বামীর প্রত্যাহার ক্ষমতাই কেবল রহিত হয় না বরং ভবিষ্যতে পুরুষ ও নারী উভয়ে সম্মত হয়ে বিবাহ করতে চাইলেও নতুন বিবাহ হতে পারে না। সূরা বাকারার আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

তিন তালাক একযোগে দেওয়া হারাম, কিন্তু কেউ দিলে তিন তালাকই হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) আছে ঃ আজকাল ধর্ম ও ধর্মীয় বিধানাবলীর প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। মূর্খদের তো কথাই নেই, অনেক লেখাপড়া জানা দলীল লেখকরাও তিন তালাকের কম তালাককে যেন তালাকই মনে করে না। অথচ দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করা হয় যে, যারা তিন তালাক দেয়, তারা পরে অনুতাপ করে এবং স্ত্রী যাতে কোনক্রমেই হাতছাড়া না হয়, সে চিন্তায়ই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। ইমাম নাসায়ী (র) মাহমুদ ইবনে লবীদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একযোগে তিন তালাক দেওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই সমগ্র উম্মতের ইজমাবলে একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও নাজায়েয। যদি কোন ব্যক্তি তিন তোহ্রে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেয়, তবে তাও অপছন্দনীয়। এ বিষয়টি উম্মতের ইজমা এবং কোরআনী আয়াতসমূহের ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটাও হারাম ও বিদ'আতী তালাকের মধ্যে দাখিল কিনা, শুধু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এটা হারাম। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) হারাম বলেন না কিন্তু তাঁদের মতেও এটা অপছন্দনীয় ও সুন্নত বিরোধী কাজ। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তফসীরে দেখুন।

কিন্তু একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম—এ ব্যাপারে যেমন সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে, তেমনি হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে তিন তালাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে। তিন তালাক একযোগে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন বিবাহও হালাল হবে না। সমগ্র উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত গোটা মযহাব চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে, তিন তালাক একযোগে দিলেও তা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা কোন কাজ হারাম হলে তার প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রভাবিত হয় না। যেমন কেউ কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যা করা হারাম হওয়া সত্ত্বেও যাকে হত্যা করা হয়, সে সর্বাবস্থায় মরেই যাবে। এমনিভাবে একযোগে তিন তালাক দেওয়া যদিও হারাম, তথাপি এর বাস্তবতা অপরিহার্য। কেবল মযহাব চতুষ্টয়ই নয় বরং সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ বিষয়েরও বিশদ বর্ণনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ—অর্থাৎ মুসলমান-দের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম কর।

অষ্টম বিধান ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এই কাজের জন্য দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোস্তাহাব, এর

উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবী না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্য সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুষ্টুমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালবাসায় পরাভূত হয়ে দাবী না করে বসে যে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদ্বয়ের জন্য ذَوَىْ عَدْل বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন বিচারক ফয়সালা দেবে না। أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়ো না।

ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ—অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকাল উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

অপরাধ ও শাস্তির আইন-কানূনে কোরআন পাকের অভূতপূর্ব প্রজ্ঞাভিত্তিক ও মুরুব্বীসুলভ নীতি ঃ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে আইন-কানূন ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রাচীন পদ্ধতি চালু আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং দেশে আইন-কানূন ও দণ্ডবিধির পুস্তক রচনা করা হয়। কোরআন পাকও আল্লাহ্ তা'আলার আইন পুস্তক। কিন্তু এর বর্ণনাভঙ্গি সারা বিশ্বের আইন পুস্তক থেকে পৃথক ও অভূতপূর্ব। এর প্রত্যেকটি আইনের অগ্রে-পশ্চাতে আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল চিন্তা দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ কোন পুলিশ ও পরিদর্শকের ভয়ে নয় বরং আল্লাহ্‌র ভয়ে আইন মেনে চলে এবং কেউ দেখুক কিংবা না দেখুক, নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায় আইন মেনে চলাকে জরুরী মনে করে। একমাত্র এ কারণেই যারা কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রাখে, তাদের মধ্যে কঠোরতর আইন প্রয়োগ করাও তেমন কঠিন হয় না। এজন্য ইসলামী সরকারকে পুলিশ, স্পেশাল পুলিশ ও তদুপরি গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় না।

কোরআন পাকের এই মুরুব্বীসুলভ নীতি সকল আইনের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনসমূহে এই নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই সম্পর্কই এমন যে, এতে প্রত্যেক কাজে কোন সাক্ষ্য সংগৃহীত হতে পারে না এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণতই খোদ স্বামী-স্ত্রীরই অন্তর ও তাদের ক্রিয়াকর্মের উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই বিবাহের খুতবায়

কোরআন পাকের যে তিনটি আয়াত পাঠ করা সুন্নতরূপে প্রমাণিত আছে ; সেই আয়াতত্রয় আল্লাহ্‌ভীতির আদেশ দ্বারা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা বিবাহ করে, তাদেরও এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজকর্ম, এমনকি গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছেন। আমরা পারস্পরিক অধিকার আদায়ে ত্রুটি করলে, একে অপরকে কষ্ট দিলে আলিমুল গায়েব আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিভাবে সূরা তালাকে তালাকের কয়েকটি বিধান বর্ণনা করতে যেয়ে প্রথম বিধানের পরেই وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ বলে আল্লাহ্‌ভীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর চারটি বিধান উল্লেখ করার পর---وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এসব বিধান অমান্য করে, সে অন্য কারও উপর নয়, নিজের উপরই জুলুম করে। এর অশুভ পরিণতি তাকেই ছারখার করে দেবে। এরপর আরও চারটি প্রাসঙ্গিক বিধান ও আইন উল্লেখ করার পর ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অতঃপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ভীতির ফযীলত ও তার ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ বর্ণনা করে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আবার ইদ্দতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে আল্লাহ্‌ভীতির আরও কল্যাণ ও ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবার বিবাহ ও তালাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সন্তানকে স্তন্যদানের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তালাক, ইদ্দত এবং স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ, স্তন্যদান ইত্যাদি বিধানের মধ্যে বারবার কোথাও পরকাল চিন্তা, কোথাও আল্লাহ্‌ভীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ এবং কোথাও তাওয়াক্কুলের কল্যাণ ও কিছু বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ভীতির বিষয়বস্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার উল্লেখ করা বাহ্যত বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু কোরআনের উপরোক্ত মুরুব্বীসুলভ নীতির রহস্য বুঝে নেওয়ার পর এর গভীর মিল সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ

---وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করেন।

تقوى শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে تقوى তথা আল্লাহ্‌ভীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে---এক. আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। দুই. তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিযিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মু'মিন-মুত্তাকীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না---(রূহুল মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন ঃ তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্য স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলা বাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।---(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের শানে-নুযূল ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আমার পুত্র সালেমকে শত্রুরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তার মা খুবই উদ্বিগ্না। এখন আমার কি করা উচিত? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তোমাকে ও ছেলের মাকে বেশী পরিমাণে 'লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' পাঠ করার আদেশ দিচ্ছি। তারা উভয়েই আদেশ পালন করলেন। এরই প্রভাবে গ্রেফতারকারী শত্রুরা একদিন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে ছেলেটি পলায়ন করে এবং ফেরার পথে শত্রুদের কয়েকটি ছাগল হাঁকিয়ে পিতার কাছে নিয়ে আসে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে শত্রুদের একটি উট পেয়ে সে তাতে সওয়ার হয়ে যায় এবং আরও কয়েকটি উট এর সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। তাঁর পিতা এই সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জ্ঞাত করান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি এই প্রশ্নও করেন যে, ছেলেটি যেসব উট ও ছাগল নিয়ে এসেছে, এগুলো আমার জন্য হালাল, না হারাম? এর পরিপ্রেক্ষিতে وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ الخ আয়াতখানি নাযিল হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রের বিরহ যখন আওফ ইবনে মালেক (রা) ও তাঁর স্ত্রীকে অস্থির করে তুলল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনের

আদেশ দিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে, তাকওয়ার আদেশের সাথে সাথে 'লা-হাওলা' পাঠ করারও আদেশ দিয়েছিলেন।--- (রূহুল মা'আনী)

এই শানে-নুযূল থেকেও একথা জানা গেল যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপক।

মাস'আলা ঃ এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান যদি কাফিরদের হাতে বন্দী হয় এবং সে তাদের কিছু ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসে, তবে সেই ধনসম্পদ গনীমতের মালরূপে গণ্য হবে এবং হালাল হবে। গনীমতের মালের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই ধনসম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সরকারী বায়তুলমালে দেওয়াও জরুরী নয়; যেমন হাদীসের ঘটনায় তা নেওয়া হয়নি। ফিকহ্‌বিদগণ বলেন ঃ কোন মুসলমান গোপনে ছাড়পত্র ছাড়াই দারুল হরব তথা শত্রুদেশে চলে গেলে যদি সেখান থেকে কাফিরদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে তা-ও হালাল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আজকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ভিসা নিয়ে শত্রুদেশে যায়, তবে তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের কোন ধনসম্পদ নিয়ে আসা তার জন্য জায়েয নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বন্দী হয়ে তাদের দেশে যায়, অতঃপর কোন কাফির তার কাছে কোন অর্থ গচ্ছিত রাখে, সেই গচ্ছিত অর্থ নিয়ে আসাও হালাল নয়। কারণ, ভিসা নিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা চুক্তির বরখেলাফ কাজ। শেষোক্ত মাস'আলায়ও আমানতকারী ব্যক্তির সাথে তার কার্যগত চুক্তি থাকে। অতএব যখন সে চাইবে, তখন গচ্ছিত অর্থ তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। এটা ফেরত না দেওয়া আত্মসাৎ ও চুক্তিভঙ্গের শামিল, যা শরীয়তে হারাম।---(মাযহারী)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হিজরতের পূর্বে অনেক কাফির অর্থ-সম্পদ আমানত রাখত। হিজরতের সময় তাঁর হাতে এমন কিছু আমানত ছিল। তিনি এসব আমানত মালিককে প্রত্যর্পণের জন্য হযরত আলী (রা)-কে পশ্চাতে রেখে যান।

বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র ঃ উপরোক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) আওফ ইবনে মালেক (রা)-কে বিপদ থেকে মুক্তি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করতে বলেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) বলেন ঃ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার বিপদ ও ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা এবং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বেশী পরিমাণে এই কালেমা পাঠ একটি পরীক্ষিত আমল। হযরত মুজাদ্দিদের বর্ণনা অনুযায়ী এই বেশীর পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক পাঁচশ বার এবং এর শুরুতে ও শেষে একশ বার করে দরূদ পাঠ করে উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করতে হবে।---(মাযহারী) হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করতে থাকেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আবূ যর, যদি সব মানুষ কেবল এই আয়াতটি অবলম্বন করে নেয়, তবে এটা সবার জন্য যথেষ্ট। ---(রূহুল মা'আনী)

অর্থাৎ সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য কামিয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ——অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার মুশকিল কাজের জন্য যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুযায়ী সবকাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا -

যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে।---(মাযহারী)

অবশ্য তাওয়াক্কুলের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট উপায়াদি ত্যাগ করা নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইচ্ছাধীন উপায়াদি অবশ্যই অবলম্বন করবে কিন্তু উপায়াদির উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে। কারণ, তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজ হতে পারে না। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ভীতি ও তাওয়াক্কুলের ফযীলত এবং বরকত বর্ণনা করার পর তালাক ও ইদ্দতের আরও কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্দতের সাধারণ বিধি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান ঃ সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি, তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যত দিনেই হোক।

إِنِ ارْتَبْتُمْ—অর্থাৎ যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদ্দত হায়েয দ্বারা গণনা করা হয় কিন্তু এসব মহিলার হায়েয বন্ধ; অতএব তাদের ইদ্দত কিভাবে গণনা করা হবে---এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার আল্লাহ্‌ভীতির ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ وَمَنْ يَتَّقِ

اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا—অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইদ্দতের বর্ণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ—এটা আল্লাহ্‌র বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا—অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ্‌ভীতির পাঁচটি কল্যাণ ঃ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ভীতির পাঁচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে----১. আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য ইহকাল ও পরকালের বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন। ২. তার জন্য রিযিকের এমন দ্বার খুলে দেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। ৩. তার সব কাজ সহজ করে দেন। ৪. তার পাপসমূহ মোচন করে দন। ৫. তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্‌ভীতির এই কল্যাণও বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্‌ভীরুর পক্ষে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যায়।

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا—আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দত, তাদের ভরণ-পোষণ এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে থাক, সেই গৃহের কোন অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে

থাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দতকালে উত্ত্যক্ত করো না ঃ لَا تُضَارُّوهُنَّ—এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা যখন ইদ্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরস্কার করে অথবা তার অভাব পূরণে কৃপণতা করে তাকে উত্ত্যক্ত করো না, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ—অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণও উম্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আযম (র)-এর মতে তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন ঃ বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণ-পোষণও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তাঁর দলীল পূর্বোক্ত এই আয়াত ঃ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ—কেননা, এই আয়াতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর কিরাত এরূপ ঃ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ—সাধারণত এক কিরাত অন্য কিরাতের তফসীর করে। অতএব প্রসিদ্ধ কিরাতে যদিও أَنْفِقُوا শব্দটি উল্লিখিত নেই কিন্তু তা উহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কিরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের যিম্মায় অপরিহার্য করে দিয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা)-কে তার স্বামী তিন তালাক

দিয়েছিল। তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেন নি। হযরত উমর (রা) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন ঃ আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আল্লাহ্র কিতাব বলে বাহ্যত এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত উমর (রা)-এর মতে ভরণ-পোষণও আয়াতের মধ্যে দাখিল। রসূলের সুন্নত বলে তাহাভী, দারে-কুতনী ও তিবরানী বর্ণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক-প্রাপ্তার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফিকহ্বিদগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (র)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে দেখুন।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ—অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব হয়ে গেলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাপ্তা মা স্তন্যদান করে, তবে স্তন্যদানের বিনিময় নেওয়া ও দেওয়া জায়েয।

দ্বাদশ বিধান ঃ স্তন্যদানের পারিশ্রমিক ঃ যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে স্তন্যদান করা স্বয়ং জননীর যিম্মায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে ঃ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ — যে কাজ কারও দায়িত্বে এমনিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া ঘুষের শামিল, যা নেওয়া দেওয়া উভয়ই নাজায়েয। এ ব্যাপারে ইদ্দতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা, বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইদ্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায়, তখন তার ভরণ-পোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে স্তন্যদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিশ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া জায়েয সাব্যস্ত করেছে।

ত্রয়োদশ বিধান ঃ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ—এর শাব্দিক অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশী না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিশ্রমিক দিতে যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

চতুর্দশ বিধান ঃ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ—অর্থাৎ স্তন্যদান করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয় অথবা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে পারিশ্রমিক নিয়েও স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে আইনত তাকে বাধ্য করা যাবে না বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়া-মমতা সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করছে, তখন কোন বাস্তব ওযর আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওযর না থাকে, কেবল রাগ-গোসার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে সে গোনাহ্‌গার হবে। তবে বিচারক তাকে স্তন্যদান করতে বাধ্য করবে না।

এমনিভাবে যদি স্বামী দারিদ্র্যের কারণে পারিশ্রমিক দিতে অক্ষম হয় এবং অন্য কোন মহিলা বিনাপারিশ্রমিকে অথবা কম পারিশ্রমিকে স্তন্যদান করতে সম্মত হয়, তবে স্বামীকে জননীর দাবী মেনে নিয়ে তার স্তন্য পান করাতেই বাধ্য করা হবে না বরং উভয় অবস্থাতে অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো যেতে পারে। হ্যাঁ, যদি অন্য মহিলা জননীর সমান পারিশ্রমিক দাবী করে, তবে সব ফিকহ্‌বিদের ঐকমত্যে অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্বামীর জন্য জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্থির হলে স্তন্যদাত্রী মহিলা সন্তানকে তার জননীর কাছে রেখে স্তন্যদান করবে, এটা জরুরী। জননীর কাছ থেকে আলাদা করে স্তন্যদান করানো জায়েয নয়। কেননা, সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে 'হিযানত' তথা লালন-পালন ও দেখাশোনায় রাখা জননীর হক। এই হক ছিনিয়ে নেওয়া জায়েয নয়।--(মাযহারী)

পঞ্চদশ বিধান ঃ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

অর্থাৎ বিত্তশালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিযিক সীমিত, সে আমদানী অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না বরং স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী বিত্তবান হলে বিত্তবানসুলভ ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালিনী না হয় বরং দরিদ্র ও ফকীর হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দারিদ্র্যসুলভ ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালিনী হয়। ইমাম আযম (র)-এর মযহাব তাই। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের উক্তি এর বিপরীত।--(মাযহারী)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا—এটা

আগের বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্ব স্বামীর উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে দারিদ্র্যসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ও সবর করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ঃ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا — অর্থাৎ কারো এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বর্তমান দারিদ্র্য চিরকাল বজায় থাকবে বরং দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ্র হাতে। তিনি দারিদ্র্যের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতে সেই স্বামীরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ না করে।--(রূহুল মা'আনী)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا
شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ
عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ
ذِكْرًا ۝ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ
رِزْقًا ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ
يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

(৮) অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তার রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে পাকড়াও করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি

দিয়েছিলাম। (৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (১০) আল্লাহ্ তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন, (১১) একজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। (১২) আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তার গোচরীভূত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছে, অতঃপর আমি তাদের (কাজকর্মের) কঠোর হিসাব নিয়েছি (অর্থাৎ তাদের কোন কুফরী কর্মই ক্ষমা করিনি বরং প্রত্যেকটির শাস্তি দিয়েছি। এখানে হিসাব বলে জিজ্ঞাসাবাদ বোঝানো হয়নি)। এবং আমি তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছি (অর্থাৎ শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছি)। তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের পরিণাম ক্ষতিই ছিল। (এ হচ্ছে দুনিয়াতে এবং পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (অবাধ্যতার পরিণাম যখন এই) অতএব হে বুদ্ধিমান লোকগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। (ঈমানও তাই চায়। ভয় কর অর্থাৎ আনুগত্য কর। এই আনুগত্যের পন্থা বলে দেওয়ার জন্য) আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশনামা প্রেরণ করেছেন (এবং এই উপদেশনামা দিয়ে) একজন রসূল (সা) (প্রেরণ করেছেন), যিনি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট বিধানাবলী পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (ঈমান ও সৎ কর্মের) আলোকে আনয়ন করেন। [উদ্দেশ্য এই যে, এই রসূল (সা)-এর মাধ্যমে যে উপদেশ পৌঁছে, তা মেনে চলাও আনুগত্য। অতঃপর আনুগত্য অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের জন্য ওয়াদা করা হচ্ছে যে] যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাদেরকে) উত্তম রিযিক দিয়েছেন। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্র আনুগত্য অবশ্য পালনীয়। কারণ আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও তদনুরূপ (সাতটি সৃষ্টি করেছেন। তিরমিযীতে আছে, এক পৃথিবীর নিচে দ্বিতীয় পৃথিবী, তার নিচে তৃতীয় পৃথিবী, এভাবে সপ্ত পৃথিবী সৃজিত হয়েছে)। এসবের (অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর) মধ্যে তাঁর (আইনগত, সৃষ্টিগত অথবা উভয় প্রকার) বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়, (এসব কথা এজন্য বলা হয়েছে) যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ সবকিছুকে (স্বীয়) জ্ঞানের পরিধিতে বেষ্টন করে রেখেছেন (এতেই বোঝা যায় যে, তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَّعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا——আয়াতে উল্লিখিত এসব জাতির হিসাব ও আযাব পরকালে হবে কিন্তু এখানে একে অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, যেন হয়েই গেছে।---(রূহুল মা'আনী) আর এরূপ হতে পারে যে, এখানে হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ নয় বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরকালে হবে কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আযাবের অর্থ ইহকালীন আযাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا——বাক্যে বর্ণিত আযাব কেবল পরকালে হবে।

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا——এই আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, اَرْسَلَ শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাযিল করেছেন কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন রসূল (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। অন্যরা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণত 'যিকর'-এর অর্থ স্বয়ং রসূল (সা) এবং অধিক যিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন যিকর হয়ে গেছেন।---(রূহুল মা'আনী)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সপ্ত পৃথিবীর কোথায় কোথায় কিভাবে আছে

وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ——এই আয়াত থেকে এতটুকু বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি, পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নিচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নিচে স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানে যেমন বিরাট ব্যবধান আছে এবং প্রত্যেক আকাশে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন সৃষ্ট জীব আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং কেউ মিথ্যা ও মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে কি, এসব তথ্যানুসন্ধানের উপর আমাদের কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে

প্রশ্নও করা হবে না। তাই নিরাপদ পন্থা এই যে, আমরা ঈমান আনব এবং বিশ্বাস করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা এতটুকুই, যে বিষয় বর্ণনা করা কোরআন জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষিগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। তাঁরা বলেছেনঃ أبهموا ما أبهمه الله অর্থাৎ যে বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বিশেষত বহমান তফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়---এমন নির্ভেজাল শিক্ষণীয় বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ্র আদেশ দ্বিবিধ----(১) আইনগত, যা আল্লাহ্র আদিষ্ট বান্দাদের জন্য ওহী ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকায়েদ, ইবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে। এগুলো মেনে চললে সওয়াব এবং অমান্য করলে আযাব হয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ আল্লাহ্র তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোন্নতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি-বিধান সমগ্র সৃষ্ট বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যস্থলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোন সৃষ্ট জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্ট জীব শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহ্র আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।

سورة التحريم

সূরা তাহ্‌রীম

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ
اَزْوَاجِكَ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٢ وَاِذْ اَسَرَّ
النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ
اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ
قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۭ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝٣ اِنْ تَتُوْبَآ
اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ
هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ
ظَهِيْرٌ ۝٤ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا
مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰۗىِٕبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰۗىِٕحٰتٍ
ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ

তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তার একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সেই বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেনঃ যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (৪) তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবত তার পালনকর্তা তাকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি (কসম খেয়ে) তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন (তাও আবার) আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য? (অর্থাৎ কোন বৈধ কাজ না করা যদিও বৈধ এবং কোন উপযোগিতার কারণে তাকে কসম দ্বারা জোরদার করাও বৈধ কিন্তু উত্তমের বিপরীত অবশ্যই; বিশেষ করে তার কারণও যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়ে স্ত্রীদেরকে খুশী করা)। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। [তিনি গোনাহ্ পর্যন্ত মাফ করে দেন, আপনি তো কোন গোনাহ করেন নি। তাই এটা আপনার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ নয় বরং স্নেহবশে আপনাকে বলা হচ্ছে যে, আপনি একটি বৈধ উপকার বর্জন করে এই কষ্ট করলেন কেন? রসূলুল্লাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন, তাই সাধারণ সম্বোধন দ্বারা কসমের কাফফারা সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ] আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য কসম খোলা (অর্থাৎ কসম ভঙ্গ করার পর তার কাফফারা দানের পন্থা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায়। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তাই তিনি স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজনাদি জেনে তোমাদের অনেক সংকট সহজ করে দেওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দেন। সেমতে কাফফারার মাধ্যমে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় করে দিয়েছেন। অতঃপর স্ত্রীদেরকে বলা হচ্ছে যে, সেই সময়টি স্মরণীয়,) যখন নবী করীম (সা) তাঁর একজন বিবির কাছে একটি কথা গোপনে বললেন। (কথাটি ছিল এইঃ আমি আর মধু পান করব না কিন্তু কারও কাছে একথা বলো না)। অতঃপর বিবি যখন তা (অন্য বিবিকে) বলে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (এই গোপন কথা প্রকাশকারিণী) বিবিকে কিছু কথা তো বললেন (যে, তুমি আমার কথা অন্যের কাছে বলে দিয়েছ) এবং কিছু বললেন না (অর্থাৎ নবীর ভদ্রতা এতটুকু যে, আদেশ পালন না করার কারণে বিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যেয়েও কথিত বাক্যগুলো পূর্ণরূপে বললেন না যে, তুমি আমার এই কথা বলে দিয়েছ, সেই কথা বলে দিয়েছ বরং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন এবং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন না, যাতে

বিবি মনে করে যে, তিনি এতটুকু বিষয়ই জানেন--এর বেশী জানেন না। এতে লজ্জা কম হবে)। অতএব নবী যখন তা বিবিকে বললেন, তখন বিবি বললেন ঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন ঃ আমাকে সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল আল্লাহ্ অবহিত করেছেন। [বিবিগণকে একথা শোনানোর কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যখন জানতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ গোপন জানেন, তখন তাঁর ভদ্রতাসুলভ আচরণ দেখে তারা আরও বেশী লজ্জিত হবে এবং তওবা করবে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে বিবিগণকে তওবা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ঃ] তোমরা উভয়েই (অর্থাৎ পয়গম্বরের দুই বিবি) যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, তবে (খুব ভাল কথা। কেননা, তওবার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে,) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে। (তোমরা পয়গম্বরকে অন্য বিবিগণ থেকে সরিয়ে একান্তভাবে নিজেদের করে নিতে চাও। এটা রসূলপ্রীতির লক্ষণ হিসাবে যদিও মন্দ নয় কিন্তু এর কারণে অন্য বিবিগণের অধিকার হরণ এবং অন্তর ব্যথিত হয়। এই হিসাবে এটা মন্দ ও তওবা করার যোগ্য)। আর যদি (এমনিভাবে) নবীর বিরুদ্ধে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ, নবীর সহায় আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানগণ। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। (উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের এসব কারসাজিতে নবীর কোন ক্ষতি হবে না--ক্ষতি তোমাদেরই হবে। কারণ, যে ব্যক্তির এমন সহায়, তাঁর রুচির বিরুদ্ধে তৎপরতার পরিণাম মন্দই মন্দ হবে। কোন কোন শানে-নুযূল অনুযায়ী এ কাজে হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা) ব্যতীত অন্যান্য বিবিও শরীক ছিলেন, যেমন হযরত সওদা ও সফিয়্যা (রা) প্রমুখ, তাই অতঃপর বহুবচন ব্যবহার করে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, তোমরা এই কল্পনাকে মনে স্থান দিয়ো না যে, পুরুষ যখন, তখন বিবিদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আর আমাদের চাইতে উত্তম বিবি কোথায়? তাই সর্বাবস্থায় আমাদের সবকিছুই সহ্য করা হবে। অতএব মনে রেখ) যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেন, তবে সম্ভবত তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে মুসলমান, ঈমানদার, আনুগত্যকারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, কতক অকুমারী ও কতক কুমারী। (কোন কোন উপযোগিতাদৃষ্টে বিধবা নারীও কাম্য হয়ে থাকে ; যেমন অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, সমবয়স্কতা ইত্যাদি। তাই একেও উল্লেখ করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রা)-এর কাছে একটু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রা)-র সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সে-ই বলবে ঃ আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। ('মাগাফীর' এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়)। সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবি বললেন ঃ সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই

মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সা) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই তিনি অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব (রা) মনঃক্ষুণ্ন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত হাফসা (রা) মধু পান করিয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশা, সওদা ও সফিয়্যা (রা) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওয়ায়েতে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।--(বয়ানুল কোরআন)

আয়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে জায়েয---গোনাহ নয় কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রসূলুল্লাহ (সা) কষ্ট স্বীকার করে নেবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা, এ কাজ রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল বিবিগণকে খুশী করার জন্য করেছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশী করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সহানুভূতিচ্ছলে বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ---এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম নিয়ে সম্বোধন না করে 'হে নবী' বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনি নিজের জন্য একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? বাক্যটি যদিও সহানুভূতিচ্ছলে বলা হয়েছে কিন্তু দৃশ্যত এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবত তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ---অর্থাৎ গোনাহ্ হলেও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাস'আলা ঃ তিন প্রকারে কোন হালাল বস্তুকে নিজের উপর হারাম করা যায়। এর বিশদ বর্ণনা সূরা মায়িদার তফসীরে উল্লিখিত হয়েছে। তা সংক্ষেপে এই যে, কেউ কোন হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে না করে কিন্তু যদি কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকেই কসম খেয়ে হারাম করে নেয়, তবে তা গোনাহ্ হবে। কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতাবশত হলে জায়েয কিন্তু উত্তমের খেলাফ। তৃতীয় প্রকার এই যে, বিশ্বাসগতভাবেও হারাম মনে করে না এবং কসম খেয়েও হারাম করে না কিন্তু কার্যত তা চিরতরে বর্জন করার সংকল্প পোষণ করে। এই সংকল্প সওয়াব মনে করে করলে বিদ'আত ও বৈরাগ্য হবে, যা শরীয়তে নিন্দনীয়। আর যদি কোন দৈহিক অথবা আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে করে তবে জায়েয। কোন কোন সূফী বুযুর্গ থেকে ভোগ-সম্ভোগ বর্জনের যেসব গল্প বর্ণিত আছে, সেগুলো এই পর্যায়েরই।

উল্লিখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। দুররে মনসূরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন। —(বয়ানুল কোরআন)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ যেক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা জরুরী অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا—অর্থাৎ নবী যখন তাঁর কোন এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েত দৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযরত যয়নব (রা)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখন মনঃক্ষুণ্ণ হল, তখন তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রা) মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হল।

فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ—অর্থাৎ সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহ্ রসূল (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন্ বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কোরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রা)-র কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে তা ফাঁস করে দেন। এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসা (রা)-কে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা (রা) অনেক নামায পড়ে অনেক রোযা রাখে। তার নাম জান্নাতে আপনার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে।—(মাযহারী)

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا—উপরোক্ত ঘটনার পশ্চাতে যে দুইজন বিবি সক্রিয় ছিলেন তাঁরা কে, এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন ঃ যে দুইজন নারী সম্পর্কে কোরআন পাকে إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা)-কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল পর্যন্ত আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বুঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওযূ করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম ঃ কোরআনে যে দুইজন নারী সম্পর্কে إِنْ تَتُوبَا বলা হয়েছে, তাঁরা কে?

হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এঁরা দুজন হলেন, হাফসা ও আয়েশা (রা)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করলেন। এতে এই ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত দুজন বিবিকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমাদের অন্তর অন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে বলে তোমরা তওবা কর, তবে ভাল কথা। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহব্বত ও সন্তুষ্টি কামনা প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমরা উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছ, যদ্দরুন তিনি ব্যথিত হয়েছেন। কাজেই এই গোনাহ্ থেকে তওবা করা জরুরী। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ—এতে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা তওবা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুশি না কর, তবে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ্, জিবরাঈল ও সমস্ত নেক মুসলমান তাঁর সহায়। সকল ফেরেশতা তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ—এতে বিবিগণের এই ধারণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে তাদের মত স্ত্রী সম্ভবত তিনি পাবেন না। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু নেই। তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মতই নয়; বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে দান করবেন। এতে জরুরী হয় না যে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٧

(৬) হে মু'মিনগণ। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (৭) হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, (যখন রসূলের বিবিগণেরও সৎ কর্ম ও আনুগত্য ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং রসূলকেও তাঁর বিবিগণকে উপদেশ দিয়ে সৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, তখন অবশিষ্ট সব উম্মতের উপরও এই কর্তব্য আরও জোরদার হয়ে গেছে যে, তারা যেন তাদের পরিবার-পরিজনের কর্ম ও চরিত্র গঠনে শৈথিল্য না করে। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে) তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর (নিজেদেরকে রক্ষা করার অর্থ বিধি-বিধান মেনে চলা এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার অর্থ তাদেরকে আল্লাহ্র বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া ও তা পালন করানোর জন্য মুখে ও হাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা। অতঃপর সেই অগ্নির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যাতে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। (তারা কারও প্রতি দয়া করে না এবং কেউ তাদের মুকাবিলা করে বাঁচতে পারে না)। তারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা (সামান্যও) অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, (তৎক্ষণাৎ) তাই করে। (মোটকথা, জাহান্নামে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ কাফিরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করে ছাড়বে। তখন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ) হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। (কারণ, এটা নিষ্ফল) তোমাদেরকে তো তারই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ—এ আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোর প্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যবানিয়া'।

اَهْلِيْكُمْ শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গোলাম-বাঁদী সবই দাখিল আছে। এমনকি, সার্বক্ষণিক চাকর-নওকরও এতে দাখিল থাকা অবান্তর নয়। এক রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত নাযিল হলে পর হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে, আমরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালন করব) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এর উপায় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। ---(রূহুল মা'আনী)

স্ত্রী সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কতব্য ঃ ফিকহ্বিদগণ বলেন ঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে ঃ হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত, তোমাদের ইয়াতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। 'তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা' ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। 'তোমাদের মিসকীন, তোমাদের ইয়াতীম' ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তাদের প্রাপ্য খুশি মনে আদায় কর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে।—(রূহুল মা'আনী)

মু'মিনদেরকে উপদেশ দানের পর يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে ঃ এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোন ওযর কবুল করা হবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى
رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَ
اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ ضَرَبَ اللّٰهُ
مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝
وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ
رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ
الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

(৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্, নবী এবং তার বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৯) হে নবী!

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! (১০) আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই-ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (১১) আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য ফিরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। (১২) আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয় মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীদের একজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পন্থাই পরিবার-পরিজনকে বলে তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করা যায়। পন্থা এই ঃ) মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র সামনে সত্যিকার তওবা কর। (অর্থাৎ অন্তরে গোনাহের কারণে পুরোপুরি অনুতাপ থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প থাকবে। এতে সকল ফরয-ওয়াজিব বিধানও দাখিল আছে। কেননা, এগুলো পালন না করা গোনাহ্ এবং যাবতীয় হারাম এবং মকরূহ বিষয়ও দাখিল আছে কেননা, এগুলো করা গোনাহ্)। আশা (অর্থাৎ ওয়াদা) আছে যে, তোমাদের পালনকর্তা (এই তওবার কারণে) তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর মুসলমান সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা দোয়া করবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই নূর শেষ পর্যন্ত রাখুন (অর্থাৎ পথিমধ্যে যেন নিভে না যায়) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান (এই দোয়ার কারণ হবে এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মু'মিন কিছু না কিছু নূর প্রাপ্ত হবে। পুলসিরাতে পৌঁছে যখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে, যা সূরা হাদীদে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মু'মিনগণ এই দোয়া করবে, যাতে মুনাফিকদের ন্যায় তাদের নূরও নিভে না যায়)। হে নবী! কাফিরদের সাথে (তরবারির মাধ্যমে) এবং মুনাফিকদের সাথে (মুখে ও বর্ণনার মাধ্যমে) জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। (দুনিয়াতে তো তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়েছে এবং পরকালে) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! (অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরকালে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিজের ঈমানই কাজে আসবে। কাফিরকে তার কোন আত্মীয়-স্বজনের ঈমান রক্ষা করতে পারবে না। এমনিভাবে মু'মিনের আত্মীয়-স্বজন কাফির হলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না)। আল্লাহ্ তা'আলা

কাফিরদের (শিক্ষার) জন্য নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা আমার দুইজন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার বিবাহিতা ছিল। অতঃপর তারা উভয়েই তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। (অর্থাৎ নবী হওয়ার কারণে বিশ্বাস ছিল যে, তারা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ধর্মের ব্যাপারে তাঁদের আনুগত্য করবে, কিন্তু তারা তা করেনি) ফলে নূহ ও লূত আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তাদের কোন কাজে আসেনি। তাদেরকে (কাফির হয়ে যাওয়ার কারণে আদেশ করা হয়েছে ঃ তোমরা উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ-কারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। (অতঃপর মুসলমানদের প্রশান্তির জন্য বলা হয়েছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের (সান্ত্বনার) জন্য ফিরাউন-পত্নীর (অর্থাৎ হযরত আছিয়ার) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, যখন সে দোয়া করল ঃ হে আমার পালনকর্তা ! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন (-এর অনিষ্ট) থেকে এবং তার দুষ্কর্ম থেকে (অর্থাৎ কুফরের ক্ষতি ও প্রভাব থেকে) মুক্ত রাখুন। আমাকে জালিম (অর্থাৎ কাফির) সম্প্রদায়ের (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখুন। (মুসল-মানদের সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ্) ইমরান-তনয়া মরিয়মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। সে তার সতীত্বকে (হালাল ও হারাম উভয় প্রকার কর্ম থেকে) বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি (জিবরাঈলের মাধ্যমে) তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী (যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছেছিল) এবং কিতাবসমূহকে (অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জীলকে) সত্যায়ন করেছিল। এতে তার আকায়িদ বর্ণিত হয়েছে)। সে ছিল আনুগত্যকারীদের একজন (এতে তার সৎ কর্ম বর্ণিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا—তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য গোনাহ্ থেকে ফিরে আসা। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। نصوح শব্দটিকে যদি نصحة থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি نصاحة থেকে উৎপন্ন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে توبة نصوحا-এর অর্থ এমন তওবা, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি--কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ্ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে نصوح শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সৎ কর্মের ছিন্নবস্ত্রে তালি সংযুক্ত করে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ বিগত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই توبة نصوح—কলবী (র) বলেন ঃ توبة نصوح হল মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ্ থেকে দূরে রাখা।

হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল তওবা কি? তিনি বললেন ঃ ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে---(১) অতীত মন্দ কর্মের জন্য অনুতাপ ; (২) যে সব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা ; (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা ; (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্য ক্ষমা নেওয়া ; (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হওয়া ; এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ্‌র নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা। ---(মাযহারী)

হযরত আলী (রা) বর্ণিত তওবার উপরোক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

عسى—عسى ربكم أن يكفر عنكم শব্দের অর্থ আশা আছে, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোন সৎ কর্ম হোক, কোনটিই জান্নাত ও মাগফিরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র জন্য জরুরী হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সৎ কর্ম করবে, তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করতে হবে। সৎ কর্মের এক প্রতিদান তো প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নিয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময়ে আইনের দৃষ্টিতে জান্নাত পাওয়া জরুরী নয়। এটা কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ তোমাদের কাউকে শুধু তার সৎ কর্ম মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ ! আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ আমাকেও। ---(মাযহারী)

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح—সূরার শেষভাগে আল্লাহ্‌ তা'আলা চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম নারীদ্বয় দুইজন পয়গম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফির ও মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় পয়গম্বরগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হযরত নূহ (আ)-র পত্নী, তার নাম 'ওয়াগেলা' বর্ণিত আছে। অপরজন লূত (আ)-এর পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে। --(কুরতুবী) তৃতীয় জন সর্ববৃহৎ কাফির, আল্লাহ্‌র দাবীদার ফিরাউনের পত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফিরাউনত্ব তাঁর পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হযরত মরিয়ম। তিনি কারও পত্নী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎ কর্মের বদৌলতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের গুণাবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মু'মিনের ঈমান তার কোন কাফির স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না এবং একজন কাফিরের কুফর তার কোন মু'মিন স্বজনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোন কাফির পাপাচারীর পত্নী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফর ও পাপাচার তার জন্য ক্ষতিকর হবে; বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎ কর্মের চিন্তা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ

عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ——এটা ফিরাউন-পত্নী হযরত আছিয়া বিন্‌তে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত। মূসা (আ) যখন যাদুকরদের মুকাবিলায় সফল হন এবং যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আছিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। ফিরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়ায়েতে আছে, ফিরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ফিরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আত্মা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেনঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ দেখিয়ে দেন।---(মাযহারী)

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ——كلمات رب বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র সহীফা বোঝানো হয়েছে এবং كتب বলে প্রসিদ্ধ ঐশী গ্রন্থ ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত বোঝানো হয়েছে।

وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ——قانتين শব্দটি قانت এর বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত ইবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের বিশেষণ। হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল ও সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফিরাউন-পত্নী আছিয়া এবং ইমরান-তনয়া মরিয়ম সিদ্ধি লাভ করেছেন।---(মাযহারী) বাহ্যত এখানে নবুয়তের গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন।---(মাযহারী)

سورة الملك

সূরা মুল্‌ক্

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩০ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ (١) الَّذِىْ
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْغَفُوْرُ (٢) الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ
مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ
كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ (٤) وَلَقَدْ زَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابَ السَّعِيْرِ (٥) وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ (٦) اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ (٧) تَكَادُ تَمَيَّزُ
مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ
نَذِيْرٌ (٨) قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ
اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ (٩) وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ
فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (١١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ
مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ (١٢) وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ
الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ
رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ
مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا
الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ
اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ؕ بَلْ
لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى
اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾
قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ
وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ
عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ
اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন----কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (৩) তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ--তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান। (৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। (৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবেঃ তোমাদের কিাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? (৯) তারা বলবেঃ হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ্ কোন কিছু নাযিল করেন নি। তোমরা মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। (১০) তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। (১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তাঁর কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (১৬) তোমরা কি ভাবনা-মুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর কাঁপতে থাকবে। (১৭) না, তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। (১৮) তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি---পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয় দেখেন। (২০) রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন

সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দেবে? বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। (২২) যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে। (২৫) কাফিররা বলেঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ--যদি আল্লাহ্‌ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফিরদেরকে কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তারই উপর ভরসা করি। সত্বরই তোমরা জানতে পারবে কে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায় তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পুণ্যময় (আল্লাহ্‌) তিনি, যাঁর কব্জায় সমস্ত রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন----কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। (কর্ম সুন্দর হওয়ার মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব এই যে, মৃত্যু চিন্তার কারণে মানুষ দুনিয়াকে ধ্বংসশীল এবং কিয়ামতের বিশ্বাসের ফলে পরকালকে অক্ষয় মনে করতে পারে এবং পরকালের সওয়াব অর্জন ও পরকালের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে কর্মতৎপর হতে পারে। জীবনের প্রভাব এই যে, জীবন না হলে কর্ম কখন করবে। অতএব কর্ম সুন্দর হওয়ার জন্য মৃত্যু যেন শর্ত এবং জীবন যেন পাত্র। নিছক না থাকাই যেহেতু মৃত্যু নয়, তাই এটা সৃজিত হতে পারে)। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (কাজেই অসুন্দর কর্মের শাস্তি এবং সুন্দর কর্মের জন্য ক্ষমা ও সওয়াব দান করেন)। তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ্‌ হাদীসে আছে, এক আকাশের উপরে অনেক দূরত্বে দ্বিতীয় আকাশ অবস্থিত। এমনিভাবে আরও আকাশ রয়েছে। অতঃপর আকাশের মজবুতী বর্ণনা করা হচ্ছে যে হে দর্শক) তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিপাত কর--কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ অগভীর দৃষ্টিতে তো অনেকবার দেখেছ। এবার গভীর দৃষ্টিতে দেখ) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ---তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (কিন্তু কোন চিড় দৃষ্টিগোচর হবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌ যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। আকাশকে এমন মজবুত করে সৃষ্টি

করেছেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও এতে কোন ত্রুটি দেখা যায় না। মোট-কথা তাঁর সব রকম ক্ষমতা আছে। আমার শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ এই যে) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি) দ্বারা সুশোভিত করেছি, এগুলোকে (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজিকে) শয়তানের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র করেছি (সূরা হাজরে এর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে) এবং আমি তাদের (অর্থাৎ শয়তানদের) জন্য (দুনিয়ার এই ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া পরকালে কুফরের কারণে) জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। যারা তাদের পালনকর্তাকে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ) অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (হয় আল্লাহ্ তার মধ্যে উপলব্ধি ও ক্রোধ সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে সে-ও কাফিরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, না হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন কেউ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, তেমনি জাহান্নাম তীব্র উত্তেজনাবশত জোশ মারতে থাকবে)। যখনই তাতে কোন (কাফির) সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে ঃ তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেনি? (যে তোমা-দেরকে এই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করত এবং ফলে তোমরা এ থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে? এই প্রশ্ন শাসানোর উদ্দেশ্যে করা হবে। অর্থাৎ পয়গম্বর তো অবশ্যই আগমন করেছিল। প্রত্যেক নবাগত সম্প্রদায়কে এই প্রশ্ন করা হবে। কেননা, কুফর ভেদে কাফিরদের সব সম্প্রদায় একের পর এক জাহান্নামে যাবে)। তারা (অপরাধ স্বীকার করে) বলবে ঃ হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছিল। অতঃপর (দুর্ভাগ্য-ক্রমে) আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ (বিধি-বিধান ও কিতাব ধরনের) কোন কিছু নাযিল করেন নি। তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা (ফেরেশতাদের কাছে) আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে থাকতাম না। মোটকথা, তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীদের প্রতি অভিশাপ। নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, (ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে) তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে (তিনি সব জানেন। কেননা) তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর নিরঙ্কুশ স্রষ্টা। অতএব তোমাদের কর্ম এবং কথাবার্তারও স্রষ্টা। জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তু সৃষ্টি করা যায় না। তাই আল্লাহ্র জন্য প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান অপরিহার্য। এখানে কেবল কথাবার্তা সম্পর্কিত জ্ঞানই উদ্দেশ্য নয়; বরং কর্মও এতে দাখিল আছে। তবে কর্মের তুলনায় কথাবার্তা বেশী বিধায় বিশেষ করে কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। (ফলে তোমরা অনায়াসে যত্রতত্র গমনাগমন করতে পার) অতএব তোমরা তার বুকের উপর বিচরণ কর এবং (পৃথিবীতে সৃষ্ট) আল্লাহ্র রিযিক আহার কর (পান কর) এবং (পানাহার করে তাঁকে স্মরণ কর। কেননা) তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (সুতরাং তাঁর নিয়ামতসমূহের শোকর আদায়, যা ঈমান ও আনুগত্য)। তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে

(সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদেরকে (কারূনের ন্যায়) ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে (ফলে তোমরা আরও নীচে চলে যাবে এবং ভূমি তোমাদের উপরে এসে যাবে) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে (সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদের উপর (আদ সম্প্রদায়ের ন্যায়) ঝন্‌ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন (ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের কুফরের উপযুক্ত শাস্তি এটাই)। অতএব (কোন উপযোগিতাবশত দুনিয়ার শাস্তি টলে গেলেই কি) সত্বরই (মৃত্যুর পরই) তোমরা জানতে পারবে (আযাব থেকে) আমার সতর্কবাণী কেমন (নির্ভুল) ছিল। (যদি দুনিয়ার শাস্তি ব্যক্তি ব্যতীত তারা কুফরের অপকারিতা বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে এর নমুনাও বিদ্যমান আছে। সেমতে) তাদের পূর্ববর্তীরা (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতএব (দেখে নাও তাদের প্রতি) আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল। (এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুফর গর্হিত। সুতরাং কোন কারণে দুনিয়াতে শাস্তি না হলেও পরজগতে শাস্তি হবে। خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ আয়াতে আকাশ সম্পর্কিত তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে এবং هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ আয়াতে পৃথিবী সম্পর্কিত প্রমাণাদি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর শূন্যমণ্ডল সম্পর্কিত প্রমাণাদি ব্যক্ত করা হচ্ছে ঃ) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি---পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী ? (উভয় অবস্থাতে ভারী ও ওজনবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলে অবাধে বিচরণ করে---মাটিতে পতিত হয় না)। দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তাদেরকে স্থির রাখে না। তিনি সবকিছু দেখেন। (যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা তো শুনলে, এখন বল) রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত কে তোমাদের সৈন্য-বাহিনী হয়ে (বিপদাপদ থেকে) তোমাদেরকে রক্ষা করবে ? কাফিররা (যারা তাদের উপাস্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে তারা) তো নিরেট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছে। (আরও বল) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দেবে ? (কিন্তু তারা এতেও প্রভাবান্বিত হয় না) বরং তারা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। (সারকথা এই যে, তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা কোন অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম নয়, ينصركم আয়াতে তাই বলা হয়েছে এবং কোন উপকার পৌঁছাতেও সমর্থ নয়, يرزقكم আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের আরাধনা করা নিরেট বোকামী। উপরে বর্ণিত কাফিরদের অবস্থা শুনে এখন চিন্তা কর যে) যে ব্যক্তি (অসমতল রাস্তার কারণে হোঁচট খেয়ে খেয়ে) উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সমতল সড়কে চলে ? (মু'মিন ও কাফিরের অবস্থা তদ্রূপই। মু'মিনের চলার পথ সরল ধর্ম এবং সে চলেও সোজা হয়ে স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে আত্মরক্ষা করে। পক্ষান্তরে কাফিরের চলার পথ বক্রতা এবং পথভ্রষ্টতাপূর্ণ এবং চলার মধ্যেও সর্বদা বিপদাপদে পতিত হয়। এমতাবস্থায়

সে গন্তব্যস্থলে কিরূপে পৌঁছবে? উপরে তওহীদের জগত সম্পর্কিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর আত্মা সম্পর্কিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) বলুন, তিনিই (এমন সক্ষম ও নিয়ামতদাতা যিনি) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (আরও) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং (কিয়ামতের দিন) তোমরা তাঁরই কাছে সমবেত হবে। কাফিররা (যখন কিয়ামতের কথা শুনে, তখন) বলে ঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা (অর্থাৎ পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারীরা) সত্যবাদী হও, (তবে বল) বলুন ঃ এর (নির্দিষ্ট) জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। আমি তো কেবল (সংক্ষেপে কিন্তু) প্রকাশ্য সতর্ককারী। অতঃপর যখন তারা একে (অর্থাৎ কিয়ামতের আযাবকে) আসন্ন দেখবে, তখন (দুঃখাতিশয্যে) কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে (অন্য আয়াতে আছে, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) এবং (তাদেরকে বলা হবে ঃ এটাই তো তোমরা চাইতে। [তোমরা বলতে আযাব আন, আযাব আন। কাফিররা তওহীদ, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়বস্তু শুনে এমন কথাবার্তা বলত, যা ছিল প্রকারান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মৃত্যু কামনা এবং তাঁকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা। তাই অতঃপর এর জওয়াব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এতে কাফিরদের আযাব এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুও সংযুক্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ] বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে (তোমাদের কামনা অনুযায়ী) ধ্বংস করেন অথবা (আমাদের আশা ও স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী) আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে (তোমাদের কি, তোমরা তো কাফিরই এবং) কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? (অর্থাৎ আমাদের যা হবে, দুনিয়াতে হবে এবং এর পরিণাম সর্বাবস্থায় শুভ। কিন্তু তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর। তোমাদের দিকে যে মহাবিপদ এগিয়ে আসছে তাকে কে প্রতিরোধ করবে? আমাদের পার্থিব বিপদাপদ দ্বারা তোমাদের সেই মহাবিপদ টলে যাবে না। অতএব নিজের চিন্তা ছেড়ে আমাদের বিপদ কামনা করা অনর্থক বৈ নয়। আপনি তাদেরকে আরও) বলুন, তিনি আমাদের প্রতি করুণাময়, আমরা (তাঁর আদেশ অনুযায়ী) তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। (সুতরাং ঈমানের বরকতে তিনি আমাদেরকে পরকালের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন এবং ভরসার বরকতে তিনি আমাদেরকে পার্থিব বিপদাপদ থেকে বাঁচাবেন অথবা সহজ করে দেবেন। অতএব সত্বরই তোমরা জানতে পারবে (যখন নিজেদেরকে আযাবে পতিত এবং আমাদেরকে মুক্ত দেখবে) প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় কে লিপ্ত আছে? (অর্থাৎ তোমরাই আছ না আমরা আছি। উপরে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যদি কাফিররা মনে করে যে, তাদের মিথ্যা উপাস্য তাদেরকে রক্ষা করবে, তবে এই ধারণার নিরসনকল্পে আপনি) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের (কূপের) পানি নিম্নে (নেমে) অদৃশ্যই হয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে স্রোতের পানি (অর্থাৎ কে কূপে স্রোত প্রবাহিত করবে এবং ভূগর্ভের গভীর থেকে পানি উপরে আনবে। কেউ যদি খনন করার স্পর্ধা দেখায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা পানি আরও নীচে গায়েব করে দিতে সক্ষম। যখন

আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় এতটুকু করতেও কেউ সক্ষম নয়, তখন পরকালে আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে কিরূপে)?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুলকের ফযীলতঃ এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। 'ওয়াকিয়া' শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং 'মুনজিয়া' শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر অর্থাৎ এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এই সূরা পাঠ করে, তাকে এই সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।---(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকুক। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কিয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে সেটা সূরা মুলক। ---(কুরতুবী)

تبارك—تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

শব্দটি برکت থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহ্‌র শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। بِيَدِهِ الْمُلْكُ——আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহ্‌র জন্য হাত অর্থে يد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু উর্ধ্বে। তাই এটা একটা متشابه শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ কারও জানার বিষয় নয়। এর পিছনে পড়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য চারটি গুণ দাবী করা হয়েছে। এক. তিনি বিদ্যমান আছেন, দুই. তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার উর্ধ্বে, তিন. তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং চার. তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দাবীর যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরের আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ্‌র কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছেঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ——এরপর

কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىْ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً থেকে خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ---এরপর

দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শূন্যমণ্ডলে বসবাসকারী সৃষ্ট জীব পক্ষীদের উল্লেখ করে اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফিরদের শাস্তি, মু'মিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুইটি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের স্বরূপ ঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ---অর্থাৎ তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দুইটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুইটি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্য 'সৃষ্টি' শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যত নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় না; বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দুইটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান আছে। বাহ্যত একটি সহীহ্ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে যবাই করে ঘোষণা করা হবে ঃ এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কিয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কিয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে যবাই করা হবে।---(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিরেট নাস্তি নয়; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তি লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার

জড় অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে মিছালে' (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তফসীরে মাযহারীতে 'আলমে মিছাল' সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর ঃ তফসীরে মাযহারীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং মানব আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে।

أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ—অর্থাৎ কাফিরকে মৃত এবং মু'মিনকে জীবিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, কাফির তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে ঃ

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ—এখানে জীবনের অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে, ; যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই প্রকার জীবন নেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ—কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড় পদার্থের মধ্যেও আস্তির জন্য অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ—অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্

তা'আলার প্রশংসা-কীর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলত মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্ব লাভ করে---এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যায় যে, পরবর্তী لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا وَكَفَى بِالْيَقِيْنِ غِنًى অর্থাৎ মৃত্যু উপদেশের জন্য এবং বিশ্বাসই ধনাঢ্যতার জন্য যথেষ্ট।---(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া সুদূরপরাহত। আল্লাহ্ যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (র) বলেনঃ মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

أَحْسَنُ عَمَلًا এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেন নি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ্র কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কর্মটি ভাল, নির্ভুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না; বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি? হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে أَحْسَنُ عَمَلًا পর্যন্ত পৌঁছে বললেনঃ সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়াদি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।---(কুরতুবী)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ---এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়

যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্য মণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরী হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নয়। যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।---(বয়ানুল কোরআন)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ

مصابيح বলে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে; বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্য অঙ্গার করে দেওয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন আগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে انقضاض الكوكب বলে দেওয়া হয়।---(কুরতুবী)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্য শয়তানরা যখন ঊর্ধ্ব গগনে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজির নীচেই বিতাড়িত করে দেওয়া হয়।---(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাফিরদের শাস্তি ও অনুগত মু'মিনদের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা আছে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا—ذلول এর শাব্দিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে ذلول বলা হয়। مناكب শব্দটি منكب-এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোন জন্তুর কাঁধ আরোহণের স্থান নয়; বরং কোমর অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহীর জন্য নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য এমন বশীভূত করে দিয়েছি

যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ—আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন ঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রফতানী আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা। اِلَيْهِ النُّشُوْرُ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্র আযাব আসতে পারে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আকাশে যিনি আছেন. তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিষ্ফল হবে। আজ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত জাতি-সমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ

কর। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানব-সত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ন্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ—অর্থাৎ তারা কি পক্ষীকুলকে মাথার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে ভারী বস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেওয়া এবং তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়া—এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির হাল-অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং নজীরবিহীন জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত কাফির ও পাপাচারীদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করতে চান, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তার গতিরোধ করতে পারে না। তোমাদের সেনাবাহিনী, সিপাই-সান্ত্রী তোমাদেরকে সেই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ—এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যে রিযিক পাচ্ছ, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়; বরং আল্লাহ্র দান ও বখশিস। তিনি তা বন্ধও করে দিতে পারেন। اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাফিরদের জন্য পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও

আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকারীর বর্ণনাও শুনে না।

بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَّنُفُورٍ—অর্থাৎ তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে।

অতঃপর কিয়ামতের মাঠে কাফির ও মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের মাঠে কাফিররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন---কাফিররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যে আল্লাহ্ তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে ঃ

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী হিদায়তপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? শেষোক্ত ব্যক্তিই মু'মিন। সে-ই হিদায়ত পেতে পারে। অতঃপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও জ্ঞানের কতিপয় বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ—অর্থাৎ আপনি বলুন, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য ঃ আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্য নাক আস্বাদনের জন্য জিহ্বা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণ করার জন্য কর্ণ এবং দেখার জন্য চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রে আনা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধান এখানে

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জ্ঞানের কেন্দ্র এর পক্ষে কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্ককে জ্ঞানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাফিরদের প্রতি হুঁশিয়ারী ও শস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ ঃ তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহ্‌র দান। তিনিই পানি বর্ষণ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পঁচন রোধ করার জন্য পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেথা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি মৃত্তিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা স্রষ্টার দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

অর্থাৎ তারা ভেবে দেখুক, তারা যে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন্ শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে, এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর বলা উচিত اللّٰه رب العالمين অর্থাৎ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন—আমাদের শক্তি নেই।

سورة القلم

সূরা কলম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫২ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢ وَاِنَّ
لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ
وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥ بِاَيِّيْكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨ وَدُّوْا لَوْ
تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ
بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣
اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥
سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦ اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ
اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝١٧ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ
مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝١٩ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝٢٠ فَتَنَادَوْا
مُصْبِحِيْنَ ۝٢١ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝٢٢
فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝٢٣ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝٢٤
وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ۝٢٥ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۝٢٦ بَلْ
نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝٢٧ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۝٢٨

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا
خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ
وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝
مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝ اِنَّ لَكُمْ
فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ
اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۝ اَمْ لَهُمْ
شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝ يَوْمَ يُكْشَفُ
عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً
اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ
سٰلِمُوْنَ ۝ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ
اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ
مَكْظُوْمٌ ۝ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ
مَذْمُوْمٌ ۝ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ

لَمَجْنُونٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নূন---শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, (২) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। (৩) আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) সত্বরই আপনি দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে। (৬) কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত। (৭) আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (৮) অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (৯) তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (১০) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, (১১) যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, (১২) যে ভাল কাজে বাধা দেয়, যে সীমা-লংঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, (১৩) কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত; (১৪) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলেঃ সেকালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দেব। (১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, (১৮) 'ইনশাআল্লাহ্' না বলে। (১৯) অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। (২০) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম। (২১) সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, (২৪) অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫)) তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল। (২৬) অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বললঃ আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (২৭) বরং আমরা তো কপালপোড়া। (২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বললঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছ না কেন? (২৯) তারা বললঃ আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎর্সনা করতে লাগল। (৩১) তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের, আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী। (৩২) সম্ভবত আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। (৩৩) শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত! (৩৪) মুত্তাকীদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত। (৩৫) আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? (৩৬) তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (৩৭) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর--- (৩৮) তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও? (৩৯) না তোমরা আমার কাছ থেকে

কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (৪০) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন---তাদের কে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল? (৪১) না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। (৪৪) অতএব যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) আমি তাদেরকে সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে? (৪৭) না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল। (৪৯) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। (৫০) অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। (৫১) কাফিররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলে ঃ সে তো একজন পাগল। (৫২) অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নূন---(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। শপথ কলমের (যদ্দ্বারা লওহে মাহ্ফুযে সৃষ্টির ভাগ্য লিখা হয়েছে) এবং (শপথ) তাদের (ফেরেশতাদের) লিখার [যারা আমলনামা লিখে---হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ তফসীরই করেছেন], আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি উন্মাদ নন (যেমন কাফিররা তাই বলে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সত্য নবী। এই দাবীর পক্ষে শপথগুলো খুবই উপযুক্ত। কেননা, কোরআন অবতরণও ভাগ্যলিপির অংশ-বিশেষ। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনার নবুয়ত আল্লাহ্র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই অবধারিত। কাজেই এটা নিশ্চিত সত্য। যারা এই সত্যকে স্বীকার করে এবং যারা অস্বীকার করে, তাদের আমলনামা ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছে। সুতরাং অস্বীকারের কারণে শাস্তি হবে। এই শাস্তিকে ভয় করে ঈমান আনা ওয়াজিব)। নিশ্চয়ই আপনার জন্য (এই প্রচারকার্যের জন্য) রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (এতেও নবুয়তের উপর জোর দিয়ে শত্রুদের বিদ্রূপ উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে এবং সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কিছুকাল সবর করুন, এর পরিণাম মহাপুরস্কার লাভ)। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী (আপনার প্রত্যেকটি কাজ সমতাগুণে গুণান্বিত এবং মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমণ্ডিত। উন্মাদ ব্যক্তি কি পূর্ণ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে? এটাও পূর্বোক্ত দোষারোপের জওয়াব।

অতঃপর সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে ; অর্থাৎ তারা যে বাজে প্রলাপোক্তি করে আপনি এজন্য দুঃখ করবেন না। কেননা) সত্বরই আপনি দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে যে, কে (সত্যিকার) পাগল ছিল ? (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাওয়াই পাগলামীর স্বরূপ। জ্ঞানবুদ্ধির লক্ষ্য হচ্ছে লাভ-লোকসান অনুধাবন করা এবং চিরন্তন লোকসানই প্রকৃত লোকসান। সুতরাং কিয়ামতে তারাও জানতে পারবে যে, সত্যের অনুগামীরাই বুদ্ধিমান ছিল, যারা এই লাভ অর্জন করেছে পরন্তু তারাই পাগল ছিল, যারা এই লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে চিরন্তন লোকসানকে বরণ করে নিয়েছে)। আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (তাই প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। প্রতিদান ও শাস্তির যৌক্তিকতা তখন তারাও বুঝে নেবে যখন বুদ্ধিমান ও পাগল কে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যখন আপনি সত্যের উপর ও তারা মিথ্যার উপর আছে, তখন) আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি। পরবর্তী আয়াতে তাদের আনুগত্যের বিষয়বস্তু জানা যায়। অর্থাৎ) তারা চায় যদি আপনি (নাউযুবিল্লাহ্ স্বীয় কর্তব্য কর্মে অর্থাৎ ধর্ম প্রচারে) নমনীয় হন তবে তারাও নমনীয় হবে। [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নমনীয় হওয়ার অর্থ প্রতিমাপূজার নিন্দা না করা এবং তাদের নমনীয় হওয়ার অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তফসীরই বর্ণনা করেছেন]। আপনি (বিশেষভাবে) এরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না, যে কথায় কথায় শপথ করে, (উদ্দেশ্য মিথ্যা শপথকারী। অধিকাংশ মিথ্যাবাদীই কথায় কথায় শপথ করে এবং স্বীয় কুকাণ্ডের কারণে আল্লাহ্র কাছে ও মানুষের কাছে) যে লাঞ্ছিত, (অন্তরে ব্যথা দেওয়ার জন্য) যে বিদ্রূপকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে ; যে ভাল কাজে বাধা দান করে, যে (সমতার) সীমালংঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। [অর্থাৎ জারজ সন্তান। সারকথা এই যে, প্রথমত মিথ্যারোপকারীদের, অতঃপর বিশেষভাবে মিথ্যারোপকারীরা যদি উপরোক্ত মন্দ বিশেষণে বিশেষিত হয়, তবে তাদের আনুগত্য করবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কতিপয় প্রধান মিথ্যারোপকারী এরূপই ছিল এবং উপরোক্ত নমনীয়তার প্রস্তাবে শরীক বরং এর উদগাতা ছিল। মোটকথা, আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না এবং তাও কেবল] এ কারণে যে, সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (অর্থাৎ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী। তার আনুগত্য করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, তার অভ্যাস হচ্ছে) যখন আমার আয়াতসমূহ তার কাছে পাঠ করা হয়, তখন সে বলে ঃ সেকালের উপকথা। (অর্থাৎ আয়াতসমূহের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব মিথ্যারোপ করাই নিষেধ করার আসল কারণ। তবে এই নিষেধাজ্ঞাকে জোরদার করার জন্য আরও কতিপয় বদভ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এরূপ ব্যক্তির শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে) আমি নাসিকা দাগিয়ে দেব (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল ও নাকের উপর কুফরের কারণে অপমান ও পরিচয়ের আলামত লাগিয়ে দেব। ফলে সে খুব লাঞ্ছিত হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর মক্কার লোকদেরকে একটি কাহিনী শুনিয়ে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আমি (মক্কার লোকদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে রেখেছি, যদ্দরুন তাদের স্পর্ধার অন্ত নেই। এতে করে আমি) তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, (যে, তারা নিয়ামতের শোকর করে ঈমান আনে, না অকৃতজ্ঞ হয়ে কুফর করে) যেমন (তাদের

পূর্বে নিয়ামত দিয়ে) পরীক্ষা করেছিলাম বাগানওয়ালাদেরকে [হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই বাগান আবিসিনিয়ায় ছিল, সায়ীদ ইবনে যুবায়র (র) বলেন, ইয়ামেনে ছিল। মক্কাবাসীদের মধ্যে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। এই বাগানের মালিকদের পিতা তার আমলে বাগানের আমদানীর সিংহভাগ গরীব-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করত। তার মৃত্যুর পর ছেলেরা বলল ঃ আমাদের পিতা নির্বোধ ছিল। তাই আমদানীর বিরাট অংশ মিসকীনকে দান করে দিত। সম্পূর্ণ আমদানী আমাদের হাতে থাকলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত থাকবে না। সেমতে আয়াতে তাদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এই ঘটনা তখন সংঘটিত হয়েছিল) যখন তারা (অর্থাৎ অধিকাংশ অথবা কতক যেমন قَالَ أَوْسَطُهُمْ বলা হয়েছে) পরস্পরে শপথ করেছিল যে, তারা অবশ্যই সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে এবং (এতদূর আস্থা ছিল যে) তারা ইনশাআল্লাহ্-ও বলল না। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানের উপর এক বিপদ এসে পতিত হল (সেটা ছিল এক অগ্নি—নির্ভেজাল অথবা বায়ু মিশ্রিত) এবং তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল যেমন কর্তিত ক্ষেত। (অর্থাৎ ফসল থেকে সম্পূর্ণ খালি। কিন্তু তারা এই বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানত না)। অতঃপর সকালে (ঘুম থেকে উঠে) তারা একে অপরকে ডেকে বলল ঃ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (ক্ষেত রূপক অর্থে বলা হয়েছে, অথবা তাতে কাণ্ডহীন উদ্ভিদ যেমন আঙুর ইত্যাদিও ছিল, অথবা বাগানের সংলগ্ন ক্ষেতও ছিল)। অতঃপর তারা পরস্পরে চুপিসারে কথা বলতে বলতে চলল যে, অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা (স্বজ্ঞানে) নিজেদেরকে না দিতে সক্ষম মনে করে যাত্রা করল (যে সব ফল বাড়ীতে নিয়ে আসবে এবং কাউকে দেবে না)। অতঃপর যখন তারা (সেখানে পৌঁছল এবং) বাগানকে (তদবস্থায়) দেখল তখন বলল ঃ নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি (এবং অন্যত্র চলে এসেছি ; কারণ এখানে তো বাগান বলতে কিছু নেই। এরপর যখন তারা চতুঃসীমা দেখে বিশ্বাস করল যে, এটাই সেই জায়গা, তখন বলল ঃ আমরা পথ ভুলিনি ;) বরং আমরা কপালপোড়া (তাই বাগানের এই দশা হয়েছে)। তাদের মধ্যে যে (কিছুটা) ভাল লোক ছিল, সে বলল ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম (যে, এরূপ নিয়ত করো না। মিসকীনদেরকে দিলে বরকত হয়। এরূপ কথা বলার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে 'ভাল লোক' বলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-ও মনে মনে এটা অপছন্দ করা সত্ত্বেও সবার সাথে শরীক ছিল। তাই আমি 'কিছুটা' শব্দটি যোগ করে দিয়েছি। অতঃপর প্রথম কথা স্মরণ করিয়ে লোকটি বলল ঃ) এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছ না কেন? (যাতে পাপ মার্জনা করা হয় এবং আরও বেশী বিপদ না আসে)। তারা (তওবাস্বরূপ) বলল ঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র। (এটা তসবীহ)। নিশ্চিতই আমরা দোষী। (এটা ইস্তেগফার)। অতঃপর তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। (কাজ নষ্ট হলে অধিকাংশ লোকের অভ্যাস এই যে, তারা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে। অতঃপর তারা সবাই একমত হয়ে) বলল ঃ নিশ্চয়ই আমরা (সবাই) সীমালংঘনকারী ছিলাম। (একা কারও দোষ ছিল না। কাজেই একে অপরকে দোষারোপ করা অনর্থক। সবাই মিলে তওবা করা দরকার)। সম্ভবত (তওবার বরকতে) আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে

উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। (এখন) আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরছি [অর্থাৎ তওবা করছি। পরিবর্তে উত্তম বাগান দুনিয়াতেও হতে পারে, পরকালেও হতে পারে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, বাগানের মালিকরা মু'মিন গোনাহ্গার ছিল। এই বাগানের বিনিময়ে দুনিয়াতে তারা কোন বাগান পেয়েছিল কিনা, তা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়নি। তবে রূহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে মসউদ (রা)-এর অসমর্থিত উক্তি লিখিত আছে যে, তাদেরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দান করা হয়েছিল। অতঃপর কাহিনীর নির্যাস বর্ণনা করা হয়েছে ঃ) শাস্তি এভাবেই আসে। (অর্থাৎ হে মক্কাবাসীরা, তোমরাও এরূপ বরং এর চাইতে বেশী শাস্তির যোগ্য। কেননা এই শাস্তি ছিল গোনাহের কারণে আর তোমরা কেবল গোনাহ্গার নও---কাফিরও) পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর। যদি তারা জানত (তবে ঈমান আনত। অতঃপর কাফিরদের মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলত ঃ لَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরুদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অবাধ্যদের ন্যায় গণ্য করব? (অর্থাৎ কাফিররা মুক্তি পেলে বাধ্য ও অবাধ্যদের মধ্যে কি পার্থক্য বাকী থাকবে, যদ্দ্বারা বাধ্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে? অন্য আয়াতে আছে ঃ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ

তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? তোমাদের কাছে কি কোন (ঐশী) কিতাব আছে, যাতে তোমরা পাঠ কর যে, তোমরা যা পছন্দ কর, তাই তোমরা পাবে? (অর্থাৎ সেই কিতাবে লিখিত আছে যে, তোমরা পরকালে নিয়ামত পাবে)? না আমার দায়িত্বে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ লিখিত আছে (যার বিষয়বস্তু এই) যে, তোমরা তাই পাবে, যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? (অর্থাৎ সওয়াব ও জান্নাত) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এ বিষয়ে কে তাদের দায়িত্বশীল? না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে, (যে তাদেরকে সওয়াব দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছে)? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয় (মোটকথা, এই বিষয়বস্তু কোন ঐশী কিতাবে নেই এবং অন্যান্য পন্থায়ও আমার শপথের অনুরূপ কোন ওয়াদা নেই; এমতাবস্থায় তারা কেউ অথবা তাদের কোন শরীক উপাস্য এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারে না। অতএব কিসের ভিত্তিতে দাবী করা হয়? অতঃপর কিয়ামতে তাদের লাঞ্ছনার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই দিন স্মরণীয়) সেদিন গোছার জ্যোতি প্রকাশ করা হবে এবং সিজদা করতে আহ্বান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এর ঘটনা এরূপ বর্ণিত আছে ঃ কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় গোছা প্রকাশ করবেন। এটা আল্লাহ্র বিশেষ কোন গুণ, যাকে কোন মিলের কারণে গোছা বলা হয়েছে। কোরআনে এর অনুরূপ আল্লাহ্র হাতের কথা আছে। এগুলোকে متشابهات রূপে অভিহিত করা হয়। এই হাদীসেই আছে, এই তাজাল্লী দেখে মু'মিন নর-নারী সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াতে লোক দেখানো সিজদা করত, তার কোমর তক্তার ন্যায় সোজা থেকে যাবে—সে সিজদা করতে সক্ষম হবে না।

এখানে সিজদা করতে আহ্বান জানানোর অর্থ সিজদার আদেশ করা নয়; বরং এই তাজাল্লীর প্রভাবে সকলেই বাধ্য হয়ে সিজদা করতে চাইবে। তাদের মধ্যে মু'মিনগণ তা করতে সক্ষম হবে এবং লোক দেখানো ইবাদতকারীরা ও কপট বিশ্বাসীরা সক্ষম হবে না। সুতবাং কাফিররা যে সক্ষম হবে না, তা বলাই বাহুল্য। কাফিররাও সিজদা করতে চাইবে। অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি (লজ্জাবশত) অবনত থাকবে এবং তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে। (এর কারণ এই যে) তারা (দুনিয়াতে) যখন সহী সালামতে ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। [অর্থাৎ ঈমান এনে ইবাদত করতে বলা হত। ঈমান ও ইবাদত ইচ্ছাধীন কাজ। দুনিয়াতে এই আদেশ পালন না করার কারণে আজ কিয়ামতে তাদের এই লাঞ্ছনা হয়েছে। অন্য আয়াতে দৃষ্টি উপরে উত্থিত থাকার কথা আছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, মাঝে মাঝে বিস্ময়ের আতিশয্যে দৃষ্টি উপরে থাকবে এবং মাঝে মাঝে লজ্জার আতিশয্যে দৃষ্টি অবনত থাকবে। আযাবে বিলম্বকে কাফিররা তাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ মনে করত। অতঃপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উপরের আয়াত থেকে যখন জানা গেল যে, তারা আযাবের যোগ্য, তখন] যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ আযাবের বিলম্ব দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না)। আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাচ্ছি, তারা টেরও পায় না। আমি (দুনিয়াতে তাদেরকে আযাব না দিয়ে) তাদেরকে সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল বলিষ্ঠ। (অতঃপর তারা যে নবুয়ত অস্বীকার করে, সেজন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে) আপনি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপেছে (তাই আপনার আনুগত্য করতে চাইছে না)। না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে, অতঃপর তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) লিপিবদ্ধ করছে? (অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অন্য কোন পন্থায় জেনে নেয়, যদ্দরুন পয়গম্বরের মুখাপেক্ষী নয়। বলা বাহুল্য উভয় বিষয় নেই। এমতাবস্থায় নবুয়ত অস্বীকার করা বিস্ময়কর ব্যাপার। অতঃপর রসূলুল্লাহ্কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। যখন জানা গেল যে, তারা কাফির, আযাবের যোগ্য এবং ঢিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সময় দেওয়া হচ্ছে। প্রতিশ্রুত সময়ে অবশ্যই আযাব হবে, তখন) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং (বিষণ্ণ মনে) মাছওয়ালা (ইউনুস পয়গম্বর)-এর মত হবেন না [যে আযাব নাযিল না হওয়ার কারণে বিষণ্ণ মনে কোথাও চলে গিয়েছিল। একাধিক জায়গায় এই ঘটনা আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ইউনুস (আ)-এর সাথে তুলনায় বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। এখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ সেই সময়টি স্মরণীয়] যখন ইউনুস (আ) দুঃখাকুল মনে দোয়া করেছিল। [এই দুঃখ ছিল একাধিক দুঃখের সমষ্টি---এক. সম্প্রদায়ের ঈমান না আনার, দুই. আযাব টলে যাওয়ার, তিন. আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে স্থানান্তরে গমন করার, এবং চার. মাছের পেটে আবদ্ধ হওয়ার। দোয়া ছিল এই ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ---এর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমা ও আটকাবস্থা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করা। সে মতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ইউনুস (আ) মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ করেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে (যে প্রান্তরে মাছের পেটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই) জনশূন্য প্রান্তরে নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হত। (সামাল দেওয়ার অর্থ তওবা কবুল করা এবং নিন্দিত অবস্থার অর্থ তার ইজতিহাদী ভুলের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে নিন্দিত হয়েছিল। এই আয়াত এবং সূরা সাফফাতের আয়াতের সারমর্ম এই যে, তওবা কবুল না হলে মাছের পেট থেকে মুক্তি সম্ভবপর ছিল না। যদি তওবা করত এবং আল্লাহ্ তা'আলা কবুল না করতেন, তবে তওবার পার্থিব বরকতস্বরূপ মাছের পেট থেকে মুক্তি তো হয়ে যেত, কিন্তু প্রান্তরে যে ভাবে পূর্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, মুক্তির পরও সেভাবে নিক্ষিপ্ত হত এবং তা নিন্দিত অবস্থায় হত। কিন্তু এখন নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়নি। কারণ তওবা কবুলের পর ভুলের কারণে নিন্দা করা হয় না)। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে (আরও বেশি) মনোনীত করলেন এবং তাকে (অধিক) সৎ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। [পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করার কারণে ইউনুসের ক্ষতি হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার কারণে উপকার হয়েছে। অতএব, আযাবের ব্যাপারে আপনিও নিজের মতানুসারে তাড়াহুড়া করবেন না; বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। এর পরিণাম শুভ হবে। কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাগল বলত। সূরার শুরুতে এক ভঙ্গিতে তা খণ্ডন করা হয়েছে। এখন ভিন্ন ভঙ্গিতে তা খণ্ডন করা হচ্ছেঃ] কাফিররা যখন কোরআন শুনে, তখন (শত্রুতার আতিশয্যে) এমন মনে হয় যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে (এটা একটা বিশেষ বাকপদ্ধতি, যেমন বলা হয়ঃ অমুক ব্যক্তি এমন দৃষ্টিতে দেখে যেন খেয়ে ফেলবে। রূহুল মা'আনীতে আছেঃ نظر الى نظر يكاد يصد عنى او يكاد يا كلنى উদ্দেশ্য এই যে, ক্রোধের আতিশয্যে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনিষ্টের দৃষ্টিতে দেখে এবং (শত্রুতাবশত তাঁর সম্পর্কে) তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ এই কোরআন তো (যা আপনি পাঠ করেন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (পাগল ব্যক্তি এমন ব্যাপক উপদেশের কথাবার্তা বলতে পারে না। এতে তাদের দোষারোপের জওয়াব হয়ে গেছে। শত্রুতাবশত বলে এ কথাটি যুক্ত হওয়ার কারণেও প্রমাণিত হয় যে, তাদের দোষারোপের ভিত্তি দুর্বল। কেননা, শত্রুতার আতিশয্যে যে কথা বলা হয়, তা দ্রূক্ষেপযোগ্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মূলকে সৃষ্ট জগতের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা

আল্লাহ্ প্রেরিত পূর্ণ বুদ্ধিমান, পূর্ণ জ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত রসূলকে (নাউযুবিল্লাহ্) উন্মাদ ও পাগল বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর সময় তার প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র অঙ্গে ফুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন। এই গোটা ব্যাপারটি কাফিরদের জ্ঞানও অনুভূতির উর্ধ্বে ছিল। তাই তারা একে পাগলামি আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি ও সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, আরাধনার যোগ্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কারও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাথী ছিল না। তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আত্মরক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যান। বাহ্য দর্শীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশ্যেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাগল বলত। সূরার প্রথম আয়াতসমূহে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ — নূন অক্ষরটি একটি খণ্ড বর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের খণ্ড বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

কলমের অর্থ এবং কলমের ফযীলত ঃ এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও মানবের লেখার কলম দাখিল আছে। এখানে বিশেষত ভাগ্যলিপির কলমও বোঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি তাই। এই বিশেষ কলম সম্পর্কে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম আরয করল ঃ কি লিখব? তখন আল্লাহ্র তকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির তকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ কলম আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীরা লেখে এবং লেখবে। সূরা ইকরার عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতে এই কলমের উল্লেখ আছে।

আয়াতে কলম বলে যদি সর্বপ্রথম সৃষ্টি তকদীরের কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কাজেই এর শপথ করা উপযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তকদীরের কলম, ফেরেশতাদের কলম ও মানুষের কলমসহ সাধারণ কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর শপথ করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে বড় বড় কাজ কলমের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। দেশ বিজয়ে তরবারির চাইতে কলম যে অধিক কার্যকর হাতিয়ার, এ কথা সর্বজন-বিদিত। আবূ হাতেম বস্তী (র) এই বিষয়বস্তুই দুটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

اذا اقسم الابطال يوما بسيفهم
وعدوه ما يكسب المجد والكرم
كفى قلم الكتاب عزا ورفعة
عدى الدهر ان الله اقسم بالقلم

অর্থাৎ যদি বীর পুরুষরা কোনদিন তাদের তরবারির শপথ করে এবং একে সম্মান ও গৌরবের কারণ মনে করে, তবে লেখকদের কলম ও তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব চিরতরে বৃদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কলমের শপথ করেছেন।

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন ঃ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন।

এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আলিমগণ বলেন ঃ কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে مَا يَسْطُرُونَ বলে বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু লেখা হয়েছে এবং লেখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ — অর্থাৎ আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামি বলছে, সেটা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্য আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না—চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোন পাগলকে তার কর্মের জন্য পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে ঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ—এতে রসূলে করীম (সা)-র উত্তম চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ জ্ঞানপাপীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও উন্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহৎ চরিত্র ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ স্বয়ং কোরআন রসূলে করীম (সা)-এর মহৎ চরিত্র অর্থাৎ কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রসূলে করীম (সা)-এর সত্তায় আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণ মাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ بعثت لاتمم مكارم الاخلاق অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।---(আবূ হাইয়ান)

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি সুদীর্ঘ দশ বছরকাল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি যেসব কাজ করেছি, সে সম্পর্কে তিনি কখনও বলেন নি যে, কাজটি এভাবে কেন করলে, অমুক কাজটি করলে না কেন? অথচ দশ বছর সময়ের মধ্যে অনেক কাজ তাঁর রুচি বিরুদ্ধও হয়ে থাকবে।---(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) আরও বলেন ঃ তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা কি বলব, মদীনার কোন বাঁদীও তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।---(বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও স্বহস্তে কাউকে প্রহার করেন নি। তবে জিহাদের ময়দানে কাফিরদেরকে আঘাত করা ও হত্যা করা প্রমাণিত আছে। এছাড়া তিনি কোন খাদিমকে অথবা স্ত্রীকে প্রহার করেন নি। তাদের মধ্যে কারও কোন ভুলভ্রান্তি হলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে কেউ আল্লাহ্র আদেশ লংঘন করলে তাকে শরীয়তসম্মত শাস্তি দিয়েছেন।---(মুসলিম)

হযরত জাবের (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সওয়ালের জওয়াবে কখনও 'না' বলেন নি। ----(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ধারে-কাছেও যেতেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল করতেন না এবং মন্দ ব্যবহারের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে দিতেন। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ রসূলে করীম (সা)-এর উক্তি এই যে, আমলের দাঁড়ি-পাল্লায় উত্তম চরিত্রের সমান